বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা ও সামাজিক অঙ্গীকার

সেলিনা আক্তার

বাল্যবিবাহ শিশুর মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বাল্যবিবাহের কারণে বিশ্বে লক্ষ লক্ষ শিশুর শৈশবকাল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর অধিকার রক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাল্যবিবাহ নিরোধের বিষয়ে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং SDGs এ বিশেষ দিকনির্দেশনা রয়েছে। উন্নত, স্বাধীন ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি মানুষের কাছে স্বপ্নের মতো। প্রতিটি শিশু স্বপ্ন নিয়ে বড়ো হয়। বাল্যবিয়ে হলে শিশুর স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবী এগিয়ে চলছে তার আপন গতিতে। এই গতির হাল ধরতে হবে নারী- পুরুষ উভয়কে। কিন্তু সামাজিক ব্যাধি বাল্যবিয়ে বাধাগ্রস্ত করছে নারী সমাজের এগিয়ে চলা। একই সাথে বাধাগ্রস্ত করছে দেশের এগিয়ে চলাও।

বাল্যবিবাহ নামটার সাথে কৈশোর কৈশোর একটা ভাব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যাগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ একটি। একসময় বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে মহামারি আকার ধারণ করেছিল। এখনো যে বাল্যবিবাহ হয় না তা নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জন্য এই শব্দটা বিভীষিকাময় এক অধ্যায়। বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বোঝানো হয়, যেখানে বর ও কনে উভয়ে বা যে কোনো একজন শিশু। বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিয়ের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বয়সের কম হলে তা আইনের চোখে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত হবে। আমাদের দেশে বৈধ বিবাহের জন্য মেয়েদের ১৮ বছর আর ছেলেদের ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে মানে বাল্যবিবাহ।

গ্রামাঞ্চলের অনেক অভিভাবক ভাবেন তার পরিবারের মানসম্মানের কথা, ভাবেন তিনি সমাজের অতিদরিদ্র একজন মানুষ। যেদিন তার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল সেদিন থেকেই যেন পরিবারের কর্তার মাথায় একটা পাহাড়সম বোঝা চেপে বসল। সেদিন থেকেই চিন্তায় চিন্তায় তার জীবন যেন অন্ধকারময়! মেয়েটা একটু একটু বড়ো হওয়ার পর অভিভাবকের চিন্তার মাত্রাটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। কোনো মতে, ১১-১২ বছর হলেই পরিবারের কর্তার দিন-রাত দৌড় শুরু হয়ে যায় ঘটকের পেছনে। যেন কোনোমতে বিয়েটা দিতে পারলেই তিনি দম ফেলে বাঁচেন।

পরিবারের কর্তা নিজ হাতে তার কন্যার একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন। তিনি নিজেও ডুব দিলেন অমানিশার কালো অন্ধকারে। অপরিণত বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর অধিকাংশ সময়ই প্রথম যে জিনিসটি সামনে আসে তা হলো, বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীর বাড়ি থেকে মেয়েটি এসে আর স্বামীর বাড়ি ফিরতে চায় না—এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে আমাদের সমাজে। যখন তার পুতুল খেলার বয়স, তখনই যদি থাকে সংসার নামক শৃঙ্খলে বন্দি করা হয়, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়ে থাকে। যখন অভিভাবকরা কোনোমতেই বুঝিয়ে-সুঝিয়েও মেয়েকে আর স্বামীর বাড়ি পাঠাতে পারেন না; তখন সমাজপতিরা এ নিয়ে বিচার-সালিসে বসেন। অথবা মামলা, থানা, আদালত করে সময় কাটাতে হয় অভিভাবকদের। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই তালাকের মাধ্যমে বিয়ের কবর রচিত হয়। আজকাল আমাদের সমাজে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, বর্তমান সময়ে যেসব স্বামী-স্ত্রীর তালাক হচ্ছে তাদের অধিকাংশই বাল্যবিবাহের শিকার। তাই বাল্যবিবাহের বিষয়ে সচেতন হতে হবে আমাকে-আপনাকে সবাইকে।

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহ হয়, বিশ্বে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন অষ্টম। আর এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে। জাতিসংঘের জনসংখ্যাবিষয়ক সংস্থা-ইউএনএফপিএ-র বৈশ্বিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৫ বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই। খুব কম বয়সে মা-ও হচ্ছেন অনেকে, যা তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি এক হাজার মেয়ের মধ্যে ৭১ জন এক বা একাধিক সন্তানের মা।

বাল্যবিয়ের কারণে নারীরা শৈশব থেকেই নানাবিধ ঝুঁকির মধ্যে পড়েন। বাল্যবিয়ের ঝুঁকিগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ভয়াবহ। শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার আগেই তাঁদের গর্ভধারণ করতে হয়। ফলে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ বাল্যবিয়ে। যারা ১৫ বছরের আগে গর্ভবতী হয়, তাদের মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি ২০-এর কোঠায় থাকা নারীদের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। সঙ্গে থাকে তাদের দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও সামাজিক কষ্ট। বাল্যবিয়ে এবং অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে শিশু মৃত্যুহারও বৃদ্ধি পায়।বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে। নারীদের শিক্ষা থেকে ঝড়ে পরার অন্যতম কারণ বাল্যবিয়ে। এতে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাও বাড়ে।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বেশ কিছু জটিল ও আন্তঃসম্পর্কিত কারণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষার অভাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, সীমিত আইনি সুরক্ষা, সংঘাত ও স্থানচ্যুতি ইত্যাদি। যদিও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেআইনি, তবুও মেয়েদের বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা করার আইনগুলো প্রায়ই প্রয়োগ করা হয় না বা দুর্বলভাবে প্রয়োগ করা হয়। সংঘাত ও বাস্তুচ্যুতির সময়ে, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বাল্যবিবাহ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন হতাশা, উদ্বেগ এবং চাপ, বিশেষ করে যদি মেয়েটিকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি দারিদ্র্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের চক্রকেও স্থায়ী করে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য একটি ব্যাপক সংস্কার পদ্ধতির প্রয়োজন যা এই অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে মোকাবিলা করে তাদের পরিবারকে বিবাহ বিলম্বিত করতে এবং তাদের সামগ্রিক সুস্থতার উন্নতি করতে সহায়তা করে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায় হলো শিক্ষা। তাই, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, বিবাহ বিলম্বিত করতে এবং তাদের জীবন সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থনৈতিক দুর্দশা বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ।বিশেষ করে দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েদের পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা।

বাল্যবিবাহ থেকে মেয়েদের রক্ষা করে এমন আইন ও নীতিগুলিকে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম যে বয়স (১৮ বছর) নির্ধারণ করা আছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি প্রদান করা। যেসব মেয়েরা বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে বা যাদের এরই মধ্যে বাল্যবিবাহের অভিজ্ঞতা আছে তাদের সহায়ক পরিষেবা যেমন কাউন্সেলিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং আইনি সহায়তার প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পুরুষ ও ছেলেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারাভিযানে তাদেরকে নিযুক্ত করা, বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব এবং সামাজিক নিয়ম পরিবর্তন করতে এবং লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নীত করতে তারা ব্যাপক মাত্রায় সাহায্য করতে পারে।

বাংলাদেশের আইনে প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিয়ে করলে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩ মাস কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিয়ে করলে তার ক্ষেত্রে ১ মাসের আটকাদেশ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি পেতে পারেন।

বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সমাজের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি (এনজিও) বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেছে এবং বিবাহ বিলম্বিত করা এবং মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগের মতো বিকল্প অভ্যাসগুলো প্রচারে অব্যাহত রেখেছে। সরকার বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রণোদনা বাস্তবায়ন করেছে, যেমন যে পরিবারগুলি তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠায় তাদের উপবৃত্তি প্রদান এবং ছোটো ব্যবসা শুরু করার জন্য মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। বাল্যবিয়ে রোধে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা। জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ ও নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯-ও চালু করেছে সরকার।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিছু সুপারিশ করা যেতে পারে। সেগুলো হলো, বাল্যবিবাহ রোধে বিবাহ নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন করা দরকার; বিবাহ নিবন্ধনে অদ্বিতীয় শনাক্তকরণ নম্বর চালু করা প্রয়োজন; বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক, সাংস্কৃতিক চর্চা, রীতিনীতি ও আচরণের পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া দরকার; দেশে বাল্যবিবাহের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি শক্তিশালী করা, সমাজের মানুষকে সচেতন করা ও বাল্যবিবাহের শিকার নারীদের এসব কার্যক্রমে যুক্ত করা যেতে পারে; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সব উদ্যোগে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তমন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন; বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা জরুরি; বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে ব্যাপক প্রচার–প্রচারণা চালিয়ে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং স্কুল পাঠ্যক্রমে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি ও বাল্যবিবাহ রোধে কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে, তা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

সর্বোপরি, বাল্যবিয়ে শুধু একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; এটি পুরো সমাজের জন্য একটি গভীর সংকট। শৈশব হারানো মেয়েরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখোমুখি হয়। আইন, নীতি, শিক্ষা ও সচেতনতা মিলিয়ে কার্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই পরিবারের, সমাজের ও সরকারের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া বাল্যবিয়ে রোধ করা অসম্ভব। মেয়েদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা ছাড়া দেশের ভবিষ্যত নিরাপদ করা যায় না।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার

পিআইডি ফিচার